পরিবেশবিদ

রেচিল কার্লসন

এমি, চিত্রাঙ্কন : ওয়েন্ডেল, বাংলাঃ সুচন্দ্রিমা

পরিবেশবিদ

রেচিল কার্লসন

এমি, চিত্রাঙ্কন : ওয়েন্ডেল, বাংলাঃ সুচন্দ্রিমা

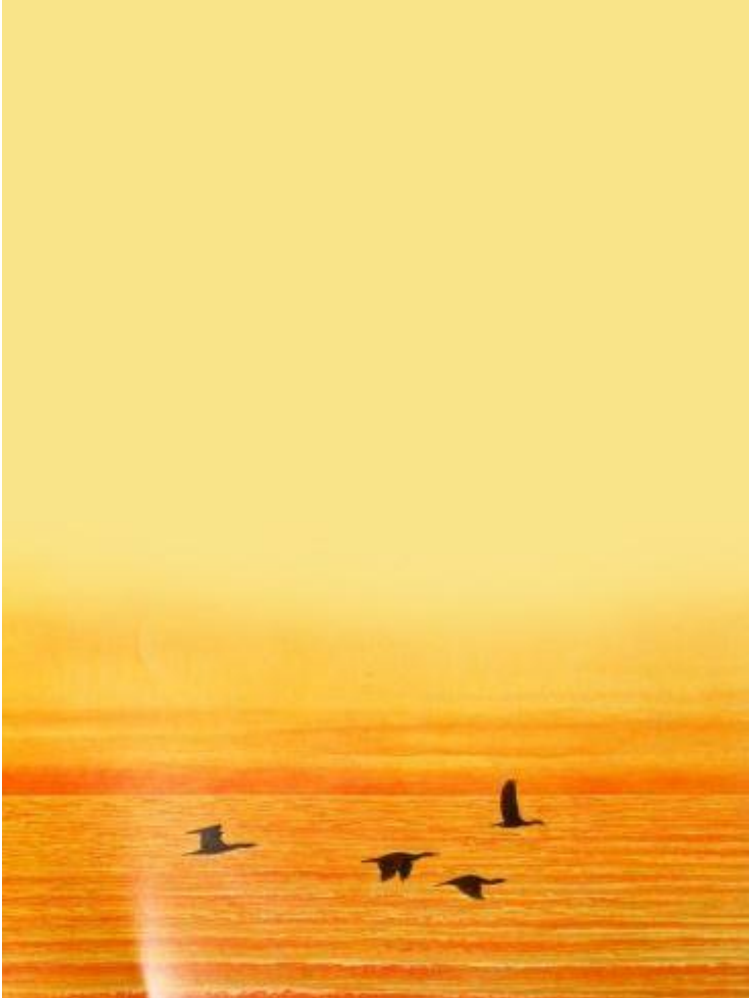

সমুদ্রীয় জীবাশ্ম

(১৯১২)

রচেলের বাড়ি সমুদ্র থেকে অনেক দূরে ছিল। তার বাড়ি পেনসিল্ভিনিয়া তে এলেঘনী নদীর পাশে ছিল, যেখান থেকে সমুদ্র ছিল অনেক মাইল দূরে । ওখানে না ছিল সমুদ্র-চিল, না হাঙ্গর, না তিমিমাছ। কিন্তু একদিন তাঁর পায়ে ঠেকল এক পাথর আর তাতে ছিল এক জীবাশ্ম। উনি সেই জীবাশ্ম তাঁর মাকে দেখালেন। এরপর উনি মায়ের সাথে সেটি কোন জীবের জীবাশ্ম তা জানার জন্য বইএর পর বই খুঁজলেন। তার মা বললেন এটি কোন সামুদ্রিক জীবের জীবাশ্ম। কোটি কোটি বছর আগে যখন এই জমি সমুদ্রের জলের নীচে ছিল তখন এই প্রাণী এখানে ছিল।

কল্পনা করো তো! ক্ষেত, বাগিচা, জঙ্গলের ওপাড়ে, যেখানে রেচেল তার কুকুরের সাথে খেলত তা পেরিয়ে তার শহর এলেঘনী, আর তারও পরে পিটসবার্গ শহর, তারও পরে যে এক অপার সমুদ্র আজো আছে তারই এক অংশ তার কাছে। সেই রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেচেলের ভাবনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উথাল পাথাল হতে লাগল।

রুপোর মেডেল (১৯১৮)

রেচেলের মা তার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল। রোজ বিকেলে তাঁরা ঘুরতে যেতেন, তখন তাঁরা নতুন নতুন কীট পতঙ্গ, পাখি আর গাছ গাছালি চিনতেন। বাকি সময় তাঁরা বই পড়তেন ও প্রকৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করতেন। রেচেল তাঁর পরিবারে সবচেয়ে ছোট ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমতি ও সবার থেকে আলাদা, একা থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর মা বলতেন রেচেল তাঁর ভাই রবার্ট আর বোন মরিয়ানার থেকে একদম আলাদা ছিলেন। তাঁর মার রেচেলের উপর ছোট থেকেই অনেক আশা ছিল।

প্রত্যেক মাসে রেচেল ডাকে আসা সেন্ট নিকোলাস ম্যাগাজিনের অপেক্ষায় থাকতেন। এই পত্রিকায় বাচ্চাদের নিজেদের লেখা যে গল্পগুলো ছাপা হত রেচিল্কে সেগুলো সবচেয়ে আকর্ষণ করত। যদি কোন বাচ্চার গল্প ছাপা হত তাহলে তাকে পুরস্কার স্বরুপ সোনা বা রুপোর মেডেল দেওয়া হত। রেচেল ও একটি গল্প লিখে পাঠালেন। তার নাম “মেঘের মধ্যে যুদ্ধ”, এই গল্প হাওয়ায় সাথে যুদ্ধের উপর ছিল।

এই গল্প পাঠানোর পর এক মাস হয়ে গেল। তারপর দুই, তিন, চার আর তারপর পাঁচ মাস হয়ে গেল। তার পর সেন্ট নিকোলাসের যে সংখ্যা এল তাতে রেচেলের লেখা ছাপা ছিল। রেচেল এর জন্য একটা রুপোর মেডেল পেয়েছিলেন।

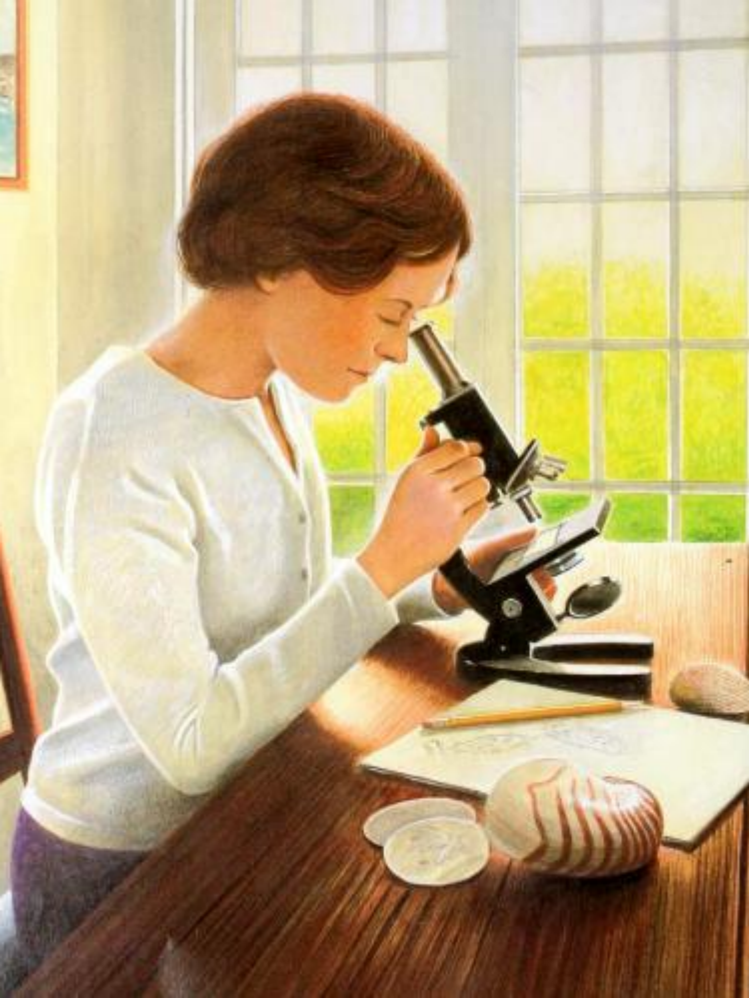

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে
(1927)

রেচিল তখন জীব্ বিজ্ঞান পড়ছিলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি লেখিকা হতে চাইতেন। পেন্সিল্ভেনিয়ার যে মহিলা কলেজে তিনি পড়তেন, সেখানে প্রত্যেকের জন্য বিজ্ঞান পড়া আবশ্যক ছিল। ওনার শিক্ষিকা মিস স্কিনার একদিন মাইক্রোস্কোপের নীচে রেচিলের স্লাইড রেখে তা ফোকাস করতে শেখাচ্ছিলেন। রেচিল সেই স্লাইডে এক পারদর্শী, লম্বা জীবাণু প্যারামিশিয়াম নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখলেন। রেচিল প্যারামিশিয়ামের উপরে বানানো নকশাগুলোর সাথে কাঁচের জানলায় উপর বর্ষার জলের ধারার , নদীর পাড়ে বালুর উপরের জলের ছাপের, আর আকাশের গায়ে মেঘের নানান আকারের সাথে অনেক মিল খুঁজে পেলেন। এক কোষীয় ঐ জীবের মধ্যে রেচিল যেন পুরো ব্রমহাণ্ডেরই এক প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন।

তারপর যখন মা রেচিলের সাথে দেখা করতে এলেন, তিনি তাঁকে বললেন যে তিনি জীব বিজ্ঞান নিয়েই পরে পড়তে চান। ছোট থেকেই রেচিল প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। এবার তিনি প্রকৃতিকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতে মনস্থির করলেন।

বুডস-হোল

(১৯২৯)

কেপ-কাল্ডে বুডস-হোল সামুদ্রিক জীব গবেষণা কেন্দ্রের চারিদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা ছিল। সেখানে কাজ করা রেচিলের জন্য স্বপ্ন পূরণের মত ছিল। ওখানে ল্যাবরেটরিতে যখন তিনি কাজ করতেন তাঁর আশপাশে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পৃথিবী বিখ্যাত সব জীব বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতেন। সেখানে পুরুষ ও মহিলা বিজ্ঞানী নির্বিশেষে সবাই মিলে মিশে উন্মুক্ত পরিবেশে কাজ করতেন। এখানে রেচিল কচ্ছপের মাথার এক নার্ভের উপর গবেষণা করেছিলেন।

রেচিলের কলেজের বন্ধু মেরি ফ্রে বুডস-হোলেই কাজ করতেন। যখন ভাঁটার সময় সমুদ্রের জলস্তর নেমে যেত, রেচিল আর মেরি সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতেন। সমুদ্রের ঢেউ পাড়ে আছড়ে পড়ত আর বালুর উপর নানান নকশা তৈরি করত। তারপর আবার জোয়ারের জল এসে সব নকশা মুছে দিত। রেচিল সমুদ্র পাড়ের এই সুন্দর দৃশ্য এক লেখিকার চোখ দিয়ে দেখতেন। আর এরপর তিনি ল্যাবরেটরিতে জোয়ার ভাঁটা কেন হয় তার কারণ ও সামুদ্রিক জীবের উপর তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করতেন।

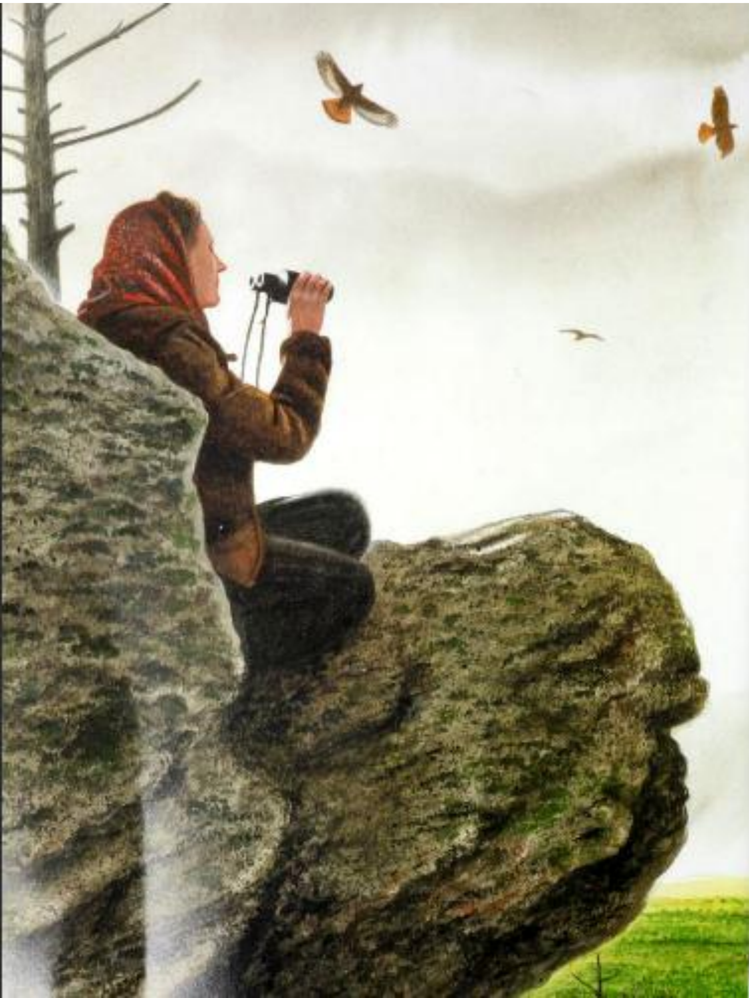

হক পর্বত
(১৯৪৫)

কারসন পরিবারে সবসময় পয়সা নিয়ে টানাটানি চলত। রেচিলের বাবা কোনো চাকরিতেই বেশীদিন টিকতে পারতেন না। মারিয়ান ও রবার্টস ও বাড়িতেই থাকতেন। তার উপর মারিয়ানের আবার দুটি বাচ্চা ছিল। এই সবার খাওয়া পড়ার ভার একমাত্র রেচিলের কাঁধেই ছিল। রেচিল আমেরিকার মৎস্য বিভাগে চাকরি করতেন, যেখানে তাঁকে বিভাগীয় সব দস্তাবেজের দেখভাল ও সম্পাদনা করতে হত।

যেখানেই যেতেন রেচিল তাঁর সাথে একটি খাতা নিয়ে যেতেন। উনি যা যা দেখতেন তাই নিয়ে খাতায় লিখে রাখতেন। একবার সপ্তাহের শেষের ছুটিতে তিনি যখন হক পর্বত ঘুরতে গেলেন তাঁর কাছে ওই খাতাটি ছিল।
পাহাড়ের উপর থেকে নীচের সমতলে ঘনীভূত হয়ে উপরে উঠে আসা কুয়াশা দেখতে দেখতে তাঁর এক অদ্ভুত অনুভুতি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন মেঘের উপরে এক রাজ্যে ভাসছেন।

সেদিন রেচিলের মনে হল তিনি প্রকৃতিকে নিয়ে খুব সুন্দর লেখা লিখতে পারবেন আর তার থেকে হয়ত কিছু উপার্জনও করতে পারবেন। তিনি ভাবলেন এইভাবেই হয়ত তাঁর গতানুগতিক ও আবদ্ধ জীবনে এক নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

আমাদের আশপাশের সমুদ্র (১৯৫১)

রেচিল যা যা লিখতেন তাতে সমুদ্রের বর্ননা অবশ্যই থাকত। সূর্যের আলোয় সমুদ্রের উপর ভেসে থাকা প্ল্যাঙ্কটন দেখতেন। তারা ছোট ছোট গাছালিদের মত দেখতে ডায়াটম খেত। এক আঁজলা সমুদ্রের জলে কোটি কোটি ডায়াটম থাকত। সমুদ্রের উপরিতল থেকে একটু নীচে এক প্রজাতির মাছ যেমন হেরিং, ম্যাকেরেল, সাদা শার্ক, আর নীল তিমিমাছেরা অন্য মাছেদের খেত। অনেক হাজার ফুট নীচে, যেখানে শুধু পাথুরে জমি ওখানে এমন মাছ পাওয়া যেত যাদের পুরো শরীর থেকে আলো বেরত আর তাতে চারিদিক ঝলমল করত। এতে করে তাদের শিকার খুঁজতে সুবিধা হত।

রেচিলের লেখার মাধ্যমে পাঠকরা সমুদ্রের নীচের জীবন সম্বন্ধে জানতে পারতেন ও সমুদ্রের গভীরে ঘুরে বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করতেন। তারা রেচিলের লেখার মাধ্যমে সমুদ্রের অপুর্ব রুপ আর তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা রহস্য ও নতুন নতুন জীব সম্বন্ধে জানতে পারতেন।

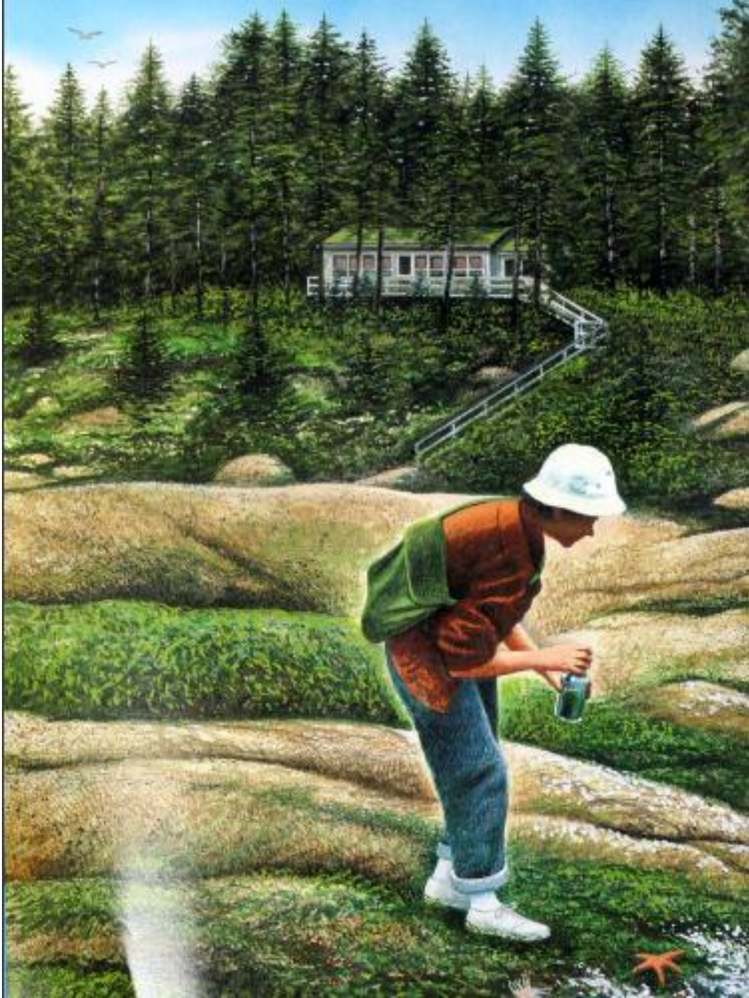

নমুনা সংগ্রহ

(১৯৫৩)

রেচিল মেন শহরে শিপ্সকট নদীর মোহনার পাশে নিজের একটা ছোট বাড়ি বানিয়েছিলেন। ওই জায়গার নাম ছিল ডগফিশ হেড। তাঁর বাড়ি নদীর তীর থেকে খানিকটা উঁচুতে ছিল। তাঁর বাড়ি থেকে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছিল নদী পর্যন্ত। রেচিল দিনের মধ্যে অনেক বার ওই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতেন। আর প্রতিবার উনি কিছু না কিছু নতুন নমুনা নদীর পাড় থেকে সংগ্রহ করতেন। পরে তিনি ওই প্রাকৃতিক নমুনাগুলি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষন করতেন। এই সব নমুনার মধ্যে সব ছোট ছোট সামুদ্রিক জীব থাকত যেমন ছোট ছোট স্টার ফিশ, গোলাপি হাইড্রাইড, সবুজ স্পঞ্জ থাকত। এই সব প্রানীরাই সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটে নিজেদের খাবারের খোঁজে।

নমুনা সংগ্রহের সবচেয়ে ভালো সময় হল বসন্ত। তখন জোয়ার ভাঁটা খুব জোড়ালো হয়। রেচিলের অনেক বন্ধুও তাঁর কাছে অনেক সময় থাকতে আসতেন আর তাঁরাও নমুনা সংগ্রহে যোগ দিতেন। ওই সামুদ্রিক জীবগুলো মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতেন। রেচিল সবসময় নমুনাগুলো ভালো করে দেখা ও পরীক্ষা করা হয়ে গেলে তাদের যেখান থেকে এনেছিলেন আবার সেখানেই ছেড়ে দিতেন।

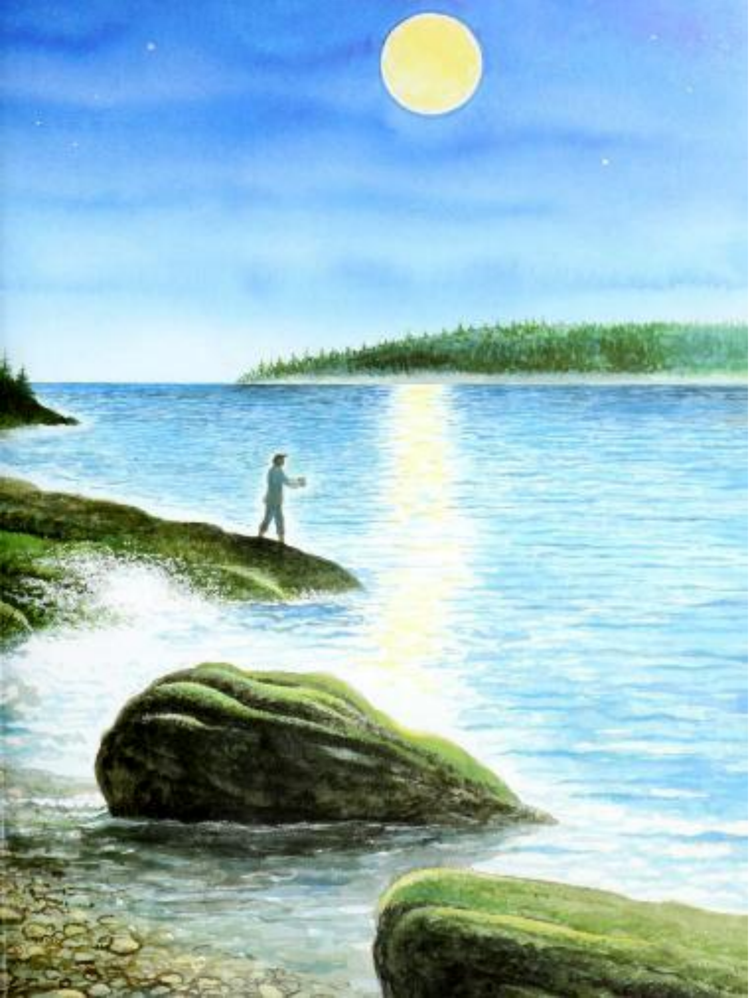

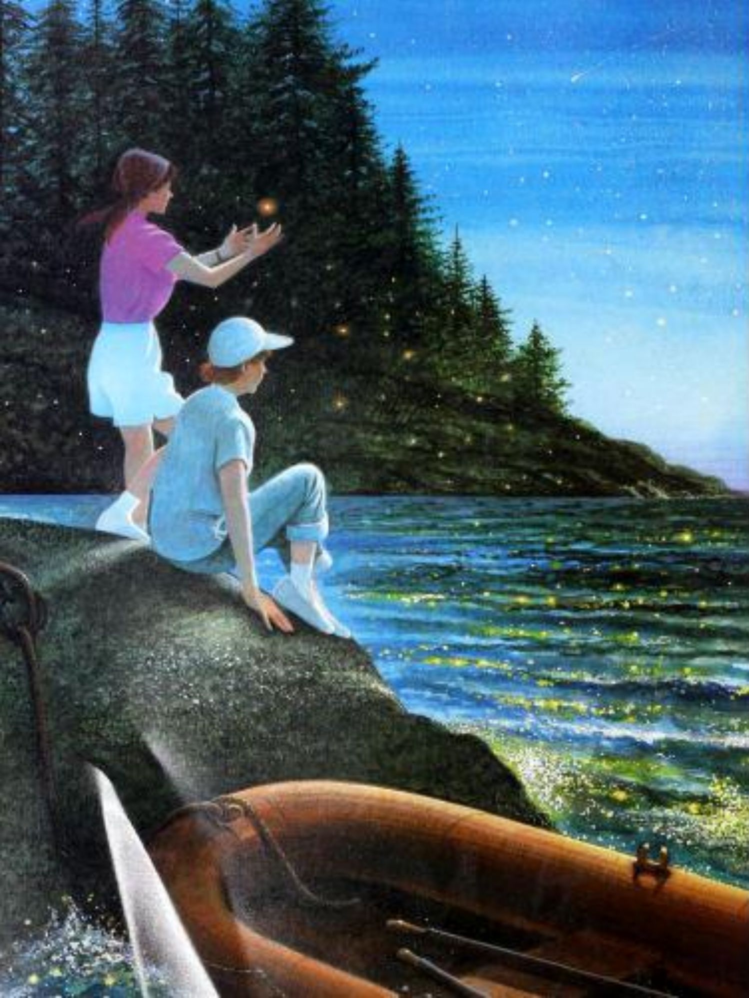

বিচ্ছুরণ
(১৯৫৬)

আগস্ট মাসে এক রাতে খুব জোড়ে হাওয়া চলছিল, জোয়ারের জলরাশি তীরে আছড়ে পরছিল। তখন রেচিল আর তার ভাইঝি মারজি তাদের ডিঙি বাঁধার জন্য সমুদ্র কিনারে গেলেন। তখন তাঁরা সমুদ্রের ঢেউয়ের এক অন্য রুপ দেখলেন। দেখলেন ঢেউয়ের জলে সবুজ আর রুপালি রঙের বিচ্ছুরণ আর বালুর উপর আছড়ে পরার পর তার বিলীন হওয়া। ঠিক তখনই রেচিল আর মারজি দেখলেন এক টুকরো আলোকে জলের দিকে উড়ে যেতে। তারা ভাবলেন কোন জোনাকি হয়ত দলছুট হয়ে পড়েছে। তাঁরা ছুটে সেই জোনাকিকে উদ্ধার করেছিলেন নিশ্চিত ডুবে মরে যাওয়া থেকে।

এটি দুই প্রজাতির প্রানীর মধ্যে এক অদ্ভুত যোগাযোগের গল্প। রেচিল এটি নিয়ে বাচ্চাদের জন্য একটি গল্প লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার ঠিক এক বছরের মাথায় মারজি মারা যান আর তাঁর ছেলে রজারের দেখাশোনার দ্বায়িত্ব এসে পরে রেচিলের উপর। রজারের বয়স তখন মাত্র পাঁচ। এই অকস্মাৎ ঘটনা রেচিলকে ঠিক সেই দলছুট জোনাকির মতই বিহ্বল করে দেয়।

লুপ্তপ্রায় জঙ্গল

(১৯৫৭)

রেচিলের কটেজের পাশেই যে জঙ্গল ছিল তা মূলত স্প্রুস গাছে ছাওয়া ছিল। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গাগুলোতে এক বিশেষ জাতের শেওলা (রেন্ডিয়ার মস) জন্মাত আর পাইন ফলগুলো সূর্যের আলো পড়লে মিষ্টি গন্ধ ছড়াত। আর ভাগ্য ভাল থাকলে রুপালি থ্রুশ পাখীর সুরেলা কন্ঠের সঙ্গীত ও শোনা যেত।

গরমের সময় রেচিলের বন্ধু ডরথি ফ্রিম্যান তাঁর সাথে এসে থাকতেন। তাঁদের দুজনেরি আশপাশের জঙ্গল খুব প্রিয় ছিল। তাঁরা সেখানে ঘুরে বেড়াতে অনাবিল আনন্দ ও শান্তি পেতেন। একদিন তাঁরা দেখলেন ডগফিশ যাওয়ার দিকের রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে। মেন শহরে অনেক লোক জমি কিনছেন। এই দেখে রেচিল ও ডরথি বুঝতে পারলেন খুব শিগগিরি এই বিকাশ তাদের সমুদ্র তট পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। রেচিল জানতেন যে জীব জন্তু ও মানুষ উভয়ের জন্যই অভয়ারণ্য – জঙ্গলের প্রয়োজন আছে। তখন রেচিল আশপাশের জঙ্গল কিনে নেবেন ভাবলেন যাতে ওখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোথাও না হারায়। কিন্তু জঙ্গলের মালিক ওনাকে বেচতে রাজী হলেন না। তারা আরও বেশী দাম চাইছিল।

শ্রবণ
(১৯৫৮)

রেচিল একজন ভাল শ্রোতা ছিলেন। উনি একদিন শ্রীমতী ওল্গা হকিন্সের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তাতে লেখা ছিল যে উড়োজাহাজ থেকে মশা তাড়ানোর ওষুধ ছড়ানোর পর তাঁদের অঞ্চলে যেসব পাখীরা গান গাইত তারা সব মারা গেছে। শ্রীমতী হকিন্স এর কারণ জানার জন্য অনেক কীট ও পক্ষীবিশারদকে চিঠি লিখেছেন। তাদের কাছ থেকে তিনি এক ভয়াবহ উত্তর পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদের অনুসারে কীটনাশকের বিষাক্ত প্রভাবে ঐ অঞ্চলে পাখী,ফড়িং, প্রজাপতি, মৌমাছি, নদীর মাছ সবই একেক করে মরে যাবে। কীটনাশকের প্রভাব সবকিছুর উপর পড়ছিল- ঘাস যা গরু খায়,গরুর দুধে, মাংসে, আর সব মানুষের শরীরের উপর।

রেচিল যিনি পৃথিবীকে ভালবাসতেন এইসব শুনে তিনি খুব ভীত ও ক্রুদ্ধ হলেন। মানুষ কিভাবে নিজেদের এই পৃথিবীর ক্ষতি করতে পারে? তারা জানে না এই দুনিয়ার সব জীব এক জটিল জালের মত একে অপরের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে?

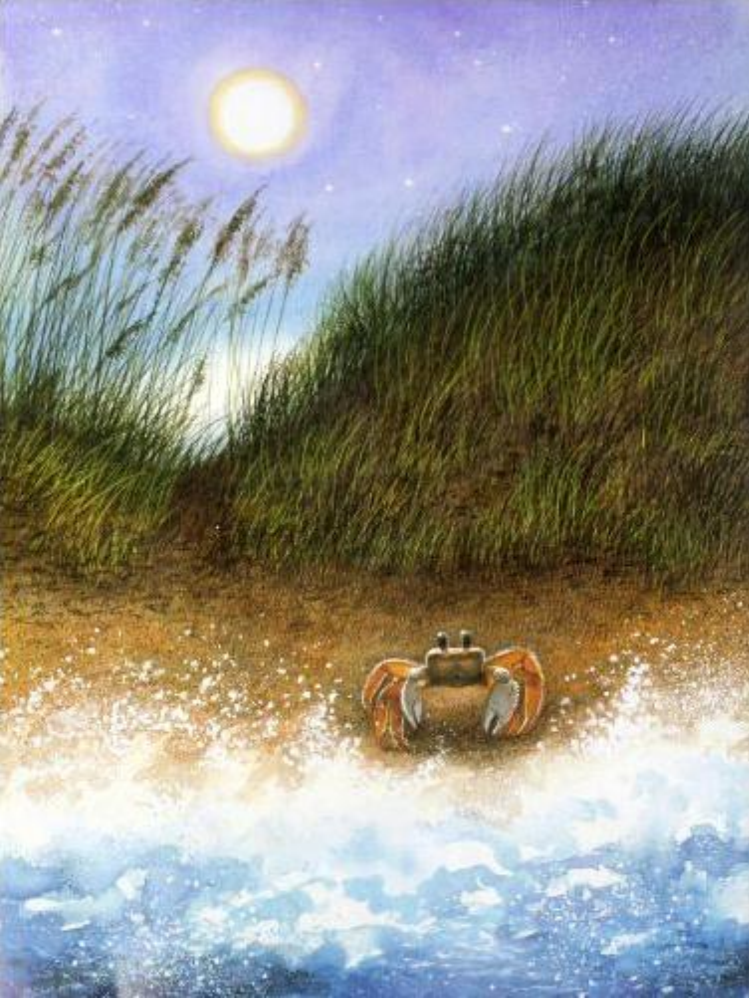

নিঃশব্দ বসন্ত

(১৯৬২)

রেচিল কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাবের উপর অনেক পড়াশুনা করলেন , তথ্য সংগ্রহ করলেন আর তার উপর ভিত্তি করে চার বছর পরিশ্রমের পর একটি বই লিখলেন। ওই বইটির নাম রাখলেন *নিঃশব্দ বসন্ত*। কেন? যদি কীটনাশকের প্রভাবে পাখীরা সব মারা যায়, তাহলে বসন্তের সময় তাদের সুমধুর গানও থাকবে না। *নিঃশব্দ বসন্ত* ছেপে বেরনোর পর কীটনাশক কোম্পানির মালিকেরা এই বইয়ের উপর হামলে পড়ল। তারা রেচিলকেও ছেড়ে কথা বললেন না। আর তিনি তো এক সাধারণ মহিলাই ছিলেন, সংবেদনশীল মহিলা। তাঁর কথা কিকরে সবাই বিশ্বাস বা ভরসা করবেন?

কিন্তু অনেক মানুষেরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন। তাঁরা অনেক বাক বিবাদ করলেন- সংবাদপত্রে, টেলিভিশনের পর্দায়, রাজধানী ওয়াশিংটনে। অবশেষে আমেরিকান কংগ্রেস কীটনাশক জনিত এই বিনাশকারি ঘটনার তদন্তের জন্য এক কমিটি গঠন করার আদেশ দিল। রেচিল শান্ত ভাবে তাদের দুপক্ষের সামনেই যা বলার ছিল বললেন। এটুকুই তাঁর করনীয় ছিল। নিজেকে তাঁর নিজের লেখা গল্পের সেই পারদর্শী ছোট কাঁকড়ার মত লাগছিল, যে একা বিধ্বংসী ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলো।

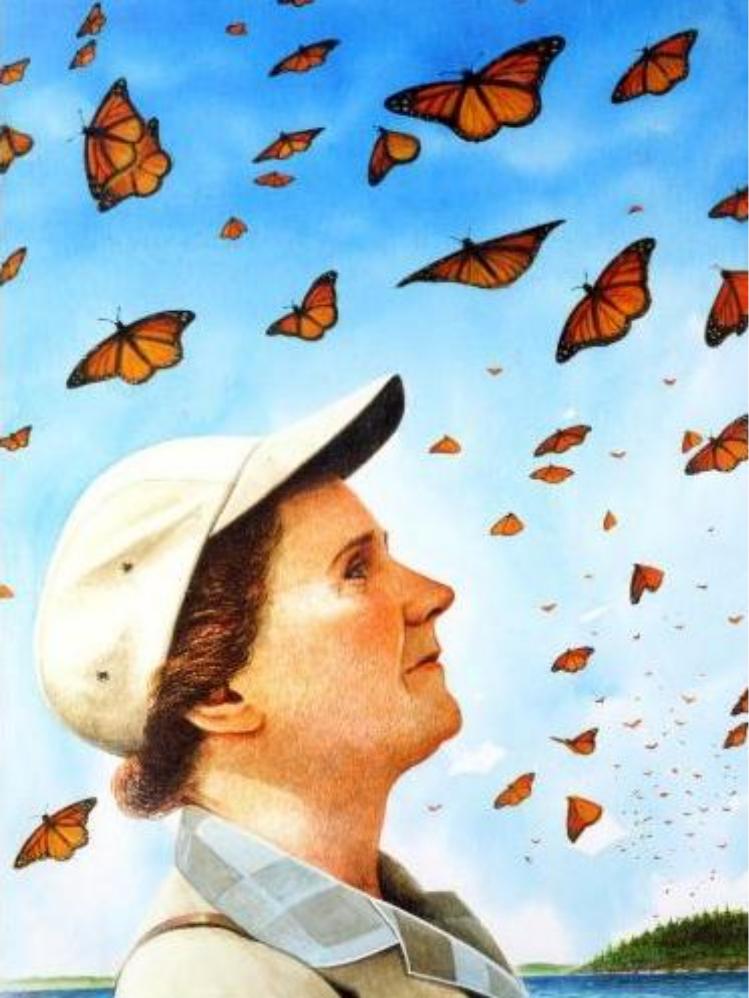

প্রজাপতির পলায়ন
(১৯৬৩)

রেচিলের মনের জোড় ও শক্তির আরও প্রয়োজন ছিল, এক সম্পুর্ণ ব্যক্তিগত কারনেও। সেই একই সময় প্রায় তিনি কান্সার আক্রান্ত হয়ে জীবনের সাথে লড়াই করছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের এক দুপুর বেলা যখন মেনের আকাশ ঘন নীল আর চারিদিকে সুন্দর ফুলের সমারোহ, তখন রেচিল আর ডরথি ফ্রিম্যান একসাথে নেওয়াগেন পয়েন্টে মোনার্ক প্রজাপতিদের পলায়ন প্রত্যক্ষ করেন। প্রজাপতিগুলো একেক করে উড়ছিল, অনেক সংখ্যায়। তাদের নরম পাখনাগুলো রোদের আলো পড়ে রঙ্গিন কাঁচের মত চমকাচ্ছিল। সব মোনার্ক প্রজাপতিগুলো মেক্সিকোর দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে হয়ত কিছু ফিরবে।

তা দেখে রেচিল তাঁর বন্ধুকে বললেন মন খারাপ না করতে। তিনি বললেন প্রজাপতির মত মানুষেরও একটা জীবন চক্র আছে। রেচিলের সময় ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রকৃতি তার ছন্দে চলতেই থাকবে। শীতের পর আবার বসন্ত আসবে। মাছেরা সমুদ্রে সাঁতার কাটবে আর পাখীরা আবার গান গাইবে।

পরিশিষ্ট
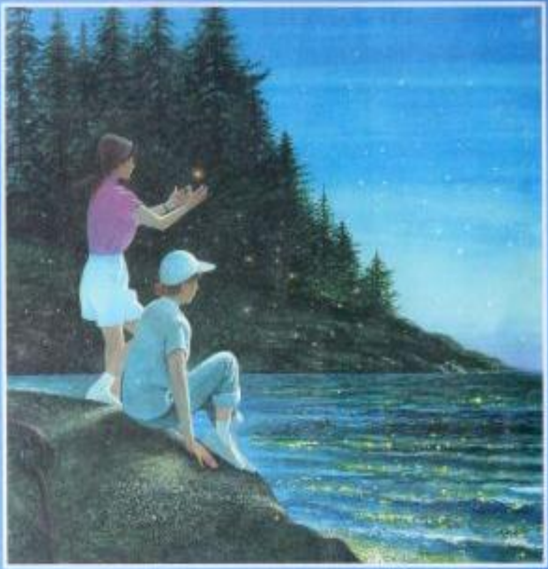
১৪ই এপ্রিল ১৯৬৪ সালে, রেচিল কারসনের মৃত্যু হয়। এরপর রাষ্ট্রপতির পরামর্শ কমিটি কীটনাশকের উপর রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে ডীডীটী আর অন্য কীটনাশকের বিষাক্ত প্রভাবের প্রমান মেলে। আজকের দিনে সবাই মনে করেন রেচিল কারসনের *নিঃশব্দ বসন্ত* বইটির প্রকাশের মাধ্যমে পৃথিবীতে পরিবেশ-আন্দোলনের সুচনা হয়।